গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

বর্ষ-১৪ সংখ্যা-৪ জুলাই-আগস্ট ২০১৭ WBBEN/2003/11192 মূল্য : ৫ টাকা

❑ পাখিদের শরীরচর্চা ১১ ❑ প্রবাল প্রাচীর ও এলনিনো ২ ❑ চেনা চুম্বকের অচেনা দোসর ৪ ❑ খাদ্যে ভেজাল ৫ ❑ ভ্রমণ ৫ ❑ পরমাণু যুদ্ধ হলে ৬ ❑ স্বাস্থ্য ৭ ❑ সভ্যতার আতঙ্ক ঃ প্লাস্টিক ও থার্মোকল ৮ ❑ অঙ্ক ১০ ❑ সংবাদ ১২ ❑ জানো কি ১৩ ❑ কুসংস্কার ১৩ ❑ মহাকাশ ১৪ ❑ কবিতা/কার্টুন/শব্দের খোঁজে ১৬

আমাদের কথা

সাম্প্রতিক বাংলার একটি ঘটনা—গ্রামবাসীরা এক জলাশয়ে একজন অসুস্থ কিশোরীকে নিয়ে এসেছেন। তাকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তার সুস্থতার কামনায় তাকে ওঝা গুনিনের হাতে সঁপে দিয়েছেন। ওঝা মন্ত্র-তন্ত্র সহযোগে তাকে জলে ডুবিয়ে বারংবার তার মাথায় আঘাত করছেন। একসময় রুগী নিস্তেজ হয়ে পড়ছে এবং অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। ওঝার এই কর্মকাণ্ডের পুরো সময়, গ্রামবাসীরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সাক্ষী হয়ে থাকলেন। কৌতুহলের বিষয় হল—দর্শকদের অনেকের হাতেই ছিল বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক অবদান 'মোবাইল'। অন্ধকার কুসংস্কার আচ্ছন্নতা ও বিজ্ঞানের দান 'মোবাইল'-এর পাশাপাশি অবস্থানের এই ঘটনা বস্তুত সারা ভারতেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

হাজার বছর অতীতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা মানুষকে সমস্ত অজানা ঘটনার কাল্পনিক সমাধানের উদ্দেশ্যে ঝাড়ফুক মন্ত্রতন্ত্রের আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। পরে হাজার বছর ধরে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যুক্তি বিশ্লেষণ, প্রমাণ সিদ্ধান্তের ও পরিবর্তিত পুনঃসিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিজ্ঞানের অবদানগুলি বৃহৎ সমাজের ব্যবহারের জন্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, বৃহৎ সমাজের চিন্তার চেতনার ক্ষেত্রে সেই যুক্তি বিশ্লেষণের আলো এসে পৌঁছলো না। অন্যদিকে অতি ক্ষুদ্র একটি শিক্ষিত সমাজে বিজ্ঞানের সেই আলো সীমাবদ্ধ রইল। প্রশ্ন হল—এই বৈষম্যের কারণ কি? আলোকিত ক্ষুদ্র সমাজ কি বিপুলাকায় অন্ধকারে তার দরদী হাত প্রসারিত করেছেন? প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার মুখস্থ-পাশ-ফেল-চাকরির গণ্ডি ছাড়িয়ে 'কি কেন'-র চিন্তন কি ছড়িয়ে দেওয়া গেছে? এই সকল 'কি কেন' নিয়ে প্রত্যেকে কি প্রত্যেকের দরজায় কড়া নাড়বো না?

প্রবাল প্রাচীর ও এলনিনো

অজয় নাথ

বেড়ানো এখন আর কোনো দেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বিশ্ব জুড়ে। এমনি এক অসাধারণ বেড়াবার জায়গা হল মহান প্রবাল প্রাচীর বা Great Barrier Reef। অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিমে রয়েছে ভারত মহাসাগর আর পূর্বে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর। পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের একটা অংশ প্রবাল সাগর। প্রবাল সাগরে রয়েছে প্রবাল প্রাচীর ও প্রবাল দ্বীপ। ২৯০০টি প্রবাল প্রাচীর ও ৯০০টি প্রবাল দ্বীপ মিলিয়ে পুরো প্রবাল প্রাচীর অঞ্চল গঠিত। ২৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ আর ৩,৪৪,৪০০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে প্রবাল দ্বীপ ও প্রবাল প্রাচীর মহাকাশ থেকেও দেখা যায়। লক্ষ লক্ষ কোটি অতি ক্ষুদ্র প্রাণী প্রবাল কীট প্রবাল প্রাচীরের নির্মাতা। পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্যের একটি। ১৯৮১ সালে প্রবাল প্রাচীর World Heritage Site বলে স্বীকৃত হয়েছে অসংখ্য প্রজাতির জীবের আশ্রয় স্থল বলে।

প্রবাল প্রাচীরের একটি বড় অংশ Great Barrier Reef Marine Park-এর অন্তর্গত। পর্যটন ও মৎস্য ব্যবসা যে কোন স্থানের সামুদ্রিক জীব জগতের জন্য ভয়ঙ্কর পরিণতি নিয়ে আসতে পারে। তাই মেরিন পার্কের আওতায় এনে মৎস্য ব্যবসা ও পর্যটন খানিকটা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। বছরে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক পর্যটককেই এখানে আসতে দেওয়া হয়। মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াও বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে যেমন জলের বয়ে যাওয়া, জলবায়ুর পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়ণ ইত্যাদি প্রবাল প্রাচীর নষ্ট করছে। প্রবাল প্রাচীরের ব্লিচিং বা প্রবাল সমূহের উপর থেকে এককোষী এলগি বা শেওলা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া কিছু সময় পর পর স্টার ফিশ বা তারা মাছের একটি বিশেষ প্রজাতি Crown of thorns starfish সংখ্যায় অনেক গুন বেড়ে যায় যা প্রবাল এবং প্রবাল প্রাচীরের ক্ষতি করে। এই সমস্ত কারণে ১৯৮৫ সালের পর

থেকে প্রবাল প্রাচীরে প্রবাল কীট অনেকটা নষ্ট হয়ে গেছে।

অস্ট্রেলিয়ার জন জাতিদের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে প্রবাল প্রাচীর জড়িয়ে আছে। পর্যটন ব্যবসা অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতির বড় অংশ জুড়ে আছে। বছরে প্রায় ৩০০ লক্ষ কোটি ডলার আয় হয় শুধু প্রবাল প্রাচীর পর্যটন ব্যবসা থেকে। দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে, উত্তরে পাপুয়া নিউগিনি থেকে দক্ষিণে লেডি ইলিয়েট ও ফ্রেজার দ্বীপ পর্যন্ত প্রবাল প্রাচীর ও প্রবাল দ্বীপের অবস্থান। টেকটনিক প্লেট থিওরি মতে সিনজয়িক সময় অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে অস্ট্রেলিয়ান প্লেট বছরে সাত সেন্টিমিটার হারে উত্তরের দিকে সরতে থাকে। এই সময় ক্যুইন্সল্যান্ড অঞ্চল সমুদ্রতল থেকে কিছুটা উপরে উঠে যায়। ঘটতে থাকে একের পর এক অগ্ন্যুৎপাত। বেশ কয়েকটি দ্বীপ ভূমির উদ্ভব হয়। প্রবাল দ্বীপগুলির জন্ম এই সময়। আড়াই হাজার কোটি বছর আগেও ক্যুইন্সল্যান্ড অঞ্চল নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে ছিল। সমুদ্রের জল ঠান্ডা থাকার জন্য প্রবাল কীটের বৃদ্ধি স্তিমিত ছিল। ধীরে ধীরে অস্ট্রেলিয়া প্লেট ক্রান্তিয় জল সীমায় চলে আসার পর প্রবাল প্রাচীরের বৃদ্ধি শুরু হয়। সমুদ্রজলের ১৫০ মিটার নীচ পর্যন্ত তার অবস্থানের কারণে সূর্যের আলো তার চেয়ে গভীরে যায় না। সূর্যের প্রবল উত্তাপের জন্য প্রবাল কীট জলের উপরেও থাকতে পারে না। প্রতি বছর প্রবাল প্রাচীর প্রস্থে ১ থেকে ৩ সেন্টিমিটার আর উচ্চতায় ২৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বাড়তে পারে। বিভিন্ন রকম টাল মাটাল অবস্থার মধ্য দিয়ে প্রবাল দ্বীপ ও প্রবাল প্রাচীর তৈরি হয়েছে। বর্তমান প্রবাল প্রাচীর সম্পূর্ণ রূপ পেয়েছে ৬ লক্ষ বছর আগে। তবে ৪ লক্ষ বছর আগে আন্তঃহিম যুগ উষ্ণ সময়ে সমুদ্র জলের তাপ মাত্রা চার ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যায় ফলে প্রবাল কীটের বৃদ্ধি কমে যায়। দু'লক্ষ বছর আগে আবার প্রবাল কীটের বৃদ্ধি শুরু হয়। প্রবাল প্রাচীরের বর্তমান অবস্থা ছয় থেকে আট হাজার বছর আগে শুরু হয়েছে। বিভিন্ন রঙের জীবন্ত প্রবাল ফুলের মতো ছড়িয়ে আছে প্রবাল প্রাচীর ও প্রবাল দ্বীপ অঞ্চল জুড়ে।

প্রবাল প্রাচীরের বিশ্ব জোড়া খ্যাতি তার জীব জগতের বৈচিত্র্যের জন্য। তিমি, শুশুক বা ডলফিন এবং জলজ স্তন্যপায়ী মিলিয়ে প্রায় ৩০টি প্রজাতির সামুদ্রিক জীবের বাস প্রবাল প্রাচীরে। এদের মধ্যে রয়েছে বামন আকারের তিমি, পিঠে কুজ যুক্ত ডলফিন ও তিমি। আর আছে ডাগগন নামে জলহস্তীর মতো প্রাণী। ১৫০০ প্রজাতির মাছ। মাছেদের কয়েকটি বিশিষ্ট প্রজাতি হল ক্লোন ফিশ, রেডবাস, লালমুখো এমপারার আর কয়েক রকমের প্রবাল ট্রাউট (Coral Trout)। আছে ১৭ রকমের সামুদ্রিক সাপ যারা প্রায় ৫০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত বিচরণ করে। ছয়টি প্রজাতির কচ্ছপ প্রবাল প্রাচীর এলাকায় আসে ডিম পাড়তে। এদের মধ্যে অলিভ রিডলের মতো নজর কাড়া প্রজাতির কচ্ছপও রয়েছে। ১৫টি প্রজাতির সামুদ্রিক ঘাস আছে জলের নীচে যা মাছেদের আশ্রয় স্থল। প্রবাল প্রাচীর ও প্রবাল দ্বীপের প্রান্তে সুন্দরী গাছের জঙ্গলে আছে মিষ্টি জলের কুমীর, সুন্দরবন অঞ্চলের মতো। ১২৫টি প্রজাতির হাঙ্গর রয়েছে এখানে। ২২৫টি প্রজাতির পরিযায়ী পাখি এখানে প্রতি বছর বাসা বাঁধে ডিম পাড়তে ও বাচ্চা ফোটাতে। এদের মোট সংখ্যা এক লক্ষ চল্লিশ হাজার থেকে এক লক্ষ সত্তর হাজার। প্রবাল প্রাচীরের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে এই পরিযায়ী পাখিরা আসে। এছাড়াও আছে ২২০০টি প্রজাতির গাছ পালা লতা গুল্ম ইত্যাদি। কিন্তু জলবায়ুর পরিবর্তন এবং সময় সময় তীব্র এলনিনো প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য্য ধীরে ধীরে নষ্ট করে দিচ্ছে।

প্রবাল কীট বেঁচে থাকে অত্যন্ত কম মাত্রায় তাপমানের হের ফেরের মধ্যে। অধিক উষ্ণতা বা অধিক শীতলতা সহ্য করতে পারে না। তাই এলনিনো বা লানিনা তীব্র হলে প্রবাল কীট ও প্রবাল প্রাচীরের ক্ষতি হয়। পূর্ব ও মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলের জলের তাপমাত্রা কখন কখন বেড়ে যায় বা কমে যায়। তাপমাত্রার বৃদ্ধি ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি হলে তাকে বলা হয় এলনিনো, একই মাত্রায় তাপমান কম হলে বলা হয় লানিনা। জলের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার চেয়ে বেশি বেড়ে গেলে বলা হয় তীব্র এল নিনো। আবার ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার চেয়ে বেশি কমে গেলে বলা হয় তীব্র লা নিনা। জলের তাপমাত্রা স্বাভাবিক থেকে এল নিনো আবার স্বাভাবিক, তা থেকে লা নিনা হয়ে আবার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় ফিরে আসার একটি চক্র সম্পূর্ণ হতে সময় লাগে কম বেশি চার বছর।

এলনিনো বা লানিনা সাধারণত শুরু হয় বছরের শেষে। অধিকাংশ সময় এলনিনো সাত থেকে নয় মাস স্থায়ী হয়। আবার কখন দেড় থেকে দু'বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। সাত থেকে নয় মাস স্থায়ী হলে বলা হয় এলনিনো অবস্থা। কিন্তু তার চেয়ে বেশি সময় স্থায়ী হলে হয় এলনিনো এপিসোড। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এলনিনো শুরু হয়েছে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তা অতি তীব্র আকার দেয়। চলে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত। মার্চ মাস থেকে তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে। জুন মাসের মধ্যে জলে তাপমাত্রা স্বাভাবিক হয়ে গেছে। এটি হল এল নিনো এপিসোড। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে জলের তাপমাত্রা কমতে শুরু করেছে। ২০১৪-১৬র এল নিনো এপিসোড গোটা বিশ্বে প্রভাব ফেলেছে। বিশ্ব উষ্ণায়ণ ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এল নিনো ভয়ঙ্কর আকার নিয়েছিল। ভারতে ২০১৪ এবং ২০১৫ সালের বর্ষায় (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম ছিল। ২০১৫ সালের গ্রীষ্মের দাব দাহে ২৫০০র বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে ভারতে। মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়েছিল।

এলনিনোর জন্য প্রশান্ত মহাসাগরের জলের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে প্রবাল প্রাচীরের ক্ষতি হয়। ১৯৯৮, ২০০২ ও ২০০৬-এর এল নিনো প্রবাল প্রাচীরের যথেষ্ট ক্ষতি করেছে। ২০১৫-১৬-র এল নিনোর জন্য মারাত্মক ক্ষতি না হলেও খানিকটা ক্ষতি অবশ্যই হয়েছে। এল নিনো সম্পূর্ণ ভাবে প্রাকৃতিক তাই আমাদের কিছু করার নেই। কিন্তু জলকে নানা ভাবে দূষিত করা, কীট নাশকের ব্যবহার, আবহাওয়া মণ্ডলে বেশি বেশি পরিমান গ্রীণ হাউস গ্যাস উৎক্ষেপণ, সবটাই মানুষের জন্য। মনে হতে পারে প্রবাল প্রাচীর অস্ট্রেলিয়ার নিজস্ব ব্যাপার তার জন্য আমরা ব্যস্ত হব কেন? কিন্তু বর্তমান সময়ের উন্নত প্রযুক্তির যুগে আমরা সবাই এক বিশ্ব জোড়া গ্রামের বাসিন্দা। We live in a global village তাই এক জনের ঘরে আগুন লাগলে তার আঁচ আমাদের গায়েও লাগবে।

E.mail.aknath54@rediffmail.com • M : 9433802339

চেনা চুম্বকের অচেনা দোসর

সুজিতকুমার নাহা

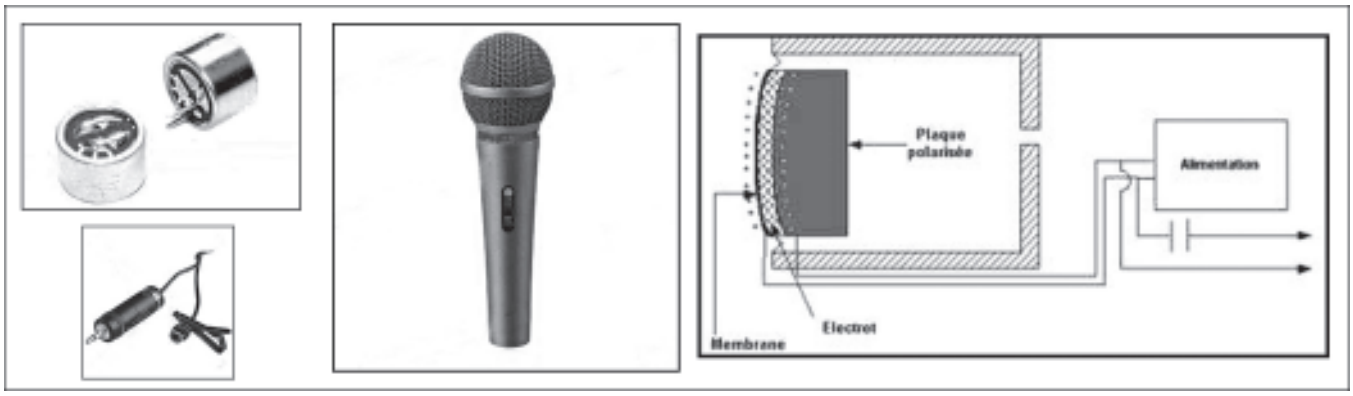

অচেনা হলেও চুম্বকের এই দোসরের সাহায্য আমরা অজান্তে নিয়ে থাকি হামেশাই। আশ্চর্য মনে হলেও কথাটা কিন্তু নির্ভেজাল সত্যি। এমন অনেক বহনযোগ্য (পোর্টেবল) বৈদ্যুতিক সামগ্রী আমরা হরবখত ব্যবহার করি, যেগুলো হয়ত বানানোই যেত না এটির উদ্ভাবন বিহনে।

ধাঁধার মতো মনে হচ্ছে? বিষয়টা তাহলে খোলসা করেই বলি!

শুরুটা হয়েছিল ভুবনখ্যাত বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডের হাত ধরে। প্রায় দুশো বছর আগে। বিদ্যুৎ নিয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিবরণ লিখতে বসে চুম্বকের দোসর বস্তুটার আভাষ দিয়েছিলেন তিনি। রেখেছিলেন উনিশ অক্ষরের একটা দাঁতভাঙ্গা নামও।

পরবর্তীতে বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু করেন বিজ্ঞানী অলিভার হেভিসাইড। ফ্যারাডের দেওয়া বিদঘুটে নাম পছন্দ না হওয়ায় তৈরি করেন নাতিদীর্ঘ ও শ্রুতিমধুর শব্দ 'ইলেকট্রেট'। জানিয়ে রাখি, Electricity আর Magnet-এর অংশ সহযোগেই তিনি Electret গঠন করেছিলেন।

হেভিসাইডের অনুকরণে 'বিদ্যুৎ' ও 'চুম্বক' শব্দদুটোর টুকরো জুড়ে তৈরি করতে পারি ইলেকট্রেট-এর বাংলা রূপভেদ 'বিম্বক'।

ফ্যারাডে কিংবা হেভিসাইডের বিম্বক সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড তাত্ত্বিক আলোচনার গন্ডিতেই সীমিত ছিল। বিম্বক বানানোর উদ্যোগ নেননি কেউই। সমকালীন প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতাই তাঁদের বাধ্য করেছিল নিশ্চেষ্ট থাকতে। জাপানি অধ্যাপক মোতোতারো ইগুচি 1925 সালে বিম্বক তৈরির কথা সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন। তাই ইগুচির বানানো নমুনাটিকেই বিশ্বের প্রথম বিম্বক বলে ধরা হয়।

জমাট বিদ্যুৎ ঃ একটি সাময়িকীর 1945 সালের এক সংখ্যায় বিম্বক বিষয়ক নিবন্ধের শিরোনাম ছিল 'ফ্রোজেন ইলেকট্রিসিটি—ইলেকট্রেট'।

বিম্বক হচ্ছে মোম, অ্যাক্রিলিক (এক ধরনের প্লাস্টিক), ইথাইল সেলুলোজ, পলিস্টাইরিন, সিরামিক ইত্যাদি স্বমেরু অণু (পোলার মলিকিউল), সমন্বিত অন্তরক বস্তুর বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি এমন একটি টুকরো যার একদিকে পজিটিভ চার্জ ও অন্যদিকে নেগেটিভ চার্জ স্থায়ী ভাবে বিরাজমান। চুম্বকের দুই প্রান্তে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর অবস্থিতির সাথে ব্যাপারটা দারুণভাবে মিলে যায়। সাদৃশ্য আরও আছে। চুম্বককে যেমন ঘিরে থাকে চৌম্বক ক্ষেত্র, ঠিক তেমনি বিম্বকের চারপাশেও বিদ্যমান থাকে স্থিরবিদ্যুৎ ক্ষেত্র। বিম্বক যেন চুম্বকেরই বৈদ্যুতিক প্রতিরূপ।

বিম্বক বানানোর কৌশল ঃ বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিম্বক তৈরি করা সম্ভব। প্রথমদিকে কায়দাটা ছিল এইরকম। উচ্চ মাত্রার বিভব ক্ষেত্র (প্রতি মিটারে প্রায় এক লক্ষ ভোল্ট) সৃষ্টি করে তার ভেতর গলিত অবস্থায় বিম্বকের উপাদানটি রেখে জমতে দেওয়া হত। উপাদানের স্বমেরু অণুগুলো সাধারণত থাকে এলোমেলোভাবে বিভিন্ন দিকে মুখ করে। হাই ভোল্টেজ ফিল্ডের আওতায় আসার পরে কিন্তু স্বমেরু অণুগুলো ক্ষেত্রের দিক অনুসারে সঠিক দিকে মুখ করে নিজেদের সাজিয়ে ফেলে। যেন বিশ্রামরত সেনারা কম্যান্ডারের নির্দেশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল! ঠান্ডা হয়ে জমে যাওয়ার পরেও বজায় থাকে এই সজ্জা। এভাবে দুই প্রান্তে বিপরীতধর্মী চার্জের প্রায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হওয়ায় জন্ম হয় বিম্বকের।

বিম্বক প্রস্তুতিতে বিপজ্জনক অত্যুচ্চ ভোল্টের বিদ্যুৎ এখন আর দরকার পড়ে না। বিম্বকের উপাদানের ভেতর অতিরিক্ত চার্জ বাইরে থেকে প্রবিষ্ট করানোর প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পর সহজে ও কম খরচে বিম্বক বানানো সম্ভব হয়েছে।

শেষ পাত ঃ বিম্বকের আবির্ভাবে আমূল পালটে গেছে মাইক্রোফোনের দুনিয়া। ডালের দানার চেয়েও ছোটো অথচ অত্যন্ত উন্নত মানের মাইক্রোফোন তৈরি হচ্ছে বিম্বকের সহায়তায়। মাইক্রোফোন সাম্রাজ্যের প্রায় নব্বই শতাংশই এখন বিম্বকের দখলে। সংখ্যার হিসেবে বছরে ইলেকট্রেট মাইক্রোফোনের উৎপাদন 200 কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

বিম্বক যে কেবল মাইক্রোফোন বানাতেই কাজে লাগে তা নয়। ফোটোকপি মেশিন, এয়ার ফিল্টার, রেডিয়েশন মিটার, বৈদ্যুতিক মাপন যন্ত্র, কম্পনশীল বস্তু থেকে শক্তি সংগ্রহ, এসব নানা ক্ষেত্রে বর্তমানে বিম্বক ব্যবহৃত হচ্ছে।

খুদে একীকৃত বর্তনী (ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট) আর লিলিপুট ইলেকট্রেট মাইক্রোফোনের যুগলবন্দিতেই সম্ভব হয়েছে ভিডিও রেকর্ডার, ল্যাপটপ, ট্যাব, ডিজিটাল রেকর্ডার, হিয়ারিং এইড, মোবাইল ফোন এসব বৈদ্যুতিন সামগ্রীর আকারগত সংকোচন।

এক দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে বিম্বকের কোনও জুড়ি নেই। চঞ্চলা বিদ্যুতের থিতু দশার নিদর্শন হিসেবে বিম্বক সত্যিই অনন্য!

E.mail.sk.naha@gmail.com • M : 9830367036

খাদ্যে ভেজাল ধরবেন কিভাবে : দুধ

জয়দেব দে

খাদ্য তালিকায় দুধ সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। একটি শিশু জন্মানোর পর দেহের পুষ্টির জন্য মাতৃদুগ্ধ সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। দেহের প্রায় সব প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিই দুধের মধ্যে রয়েছে। দুধ একটি সুষম খাদ্য। দুধ থেকে প্রচুর পরিমানে দুগ্ধজাত খাদ্য তৈরি হয় যেমন পনির, ছানা, রসগোল্লা, সন্দেশসহ নানা ধরনের মিষ্টি, আইসক্রীম ইত্যাদি।

ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার (FSSI) উপ অধিকর্তা জানিয়েছেন খাবারের মান নিয়ে সন্দেহ ও ভেজাল প্রমাণিত হলে আর্থিক জরিমানা ও কারাদন্ড দুই-ই হতে পারে। আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় খাদ্য শিল্পের এক বিরাট বাজারের সম্ভাবনা রয়েছে। বাস্তবে খাবারের মান নিম্নমানের। ফলে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সমস্যা বাড়ছে। রাস্তার ধারে, হোটেল বা রেস্তোরায় যে খাবার বিক্রি হয় তা নজরদারি করায় দায়িত্ব রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের। জেলায় হেলথ্ ইনস্পেক্টর বা ফুড ইনসপেক্টরদের খাদ্যের গুণমান 'পরীক্ষা' করার কথা। 'বাস্তবে খাদ্যের গুণমান পরীক্ষা করার জন্য উপযুক্ত কোন পরিকাঠামো নেই বললেই চলে। খোলা বাজারে যেভাবে খাবার বিক্রি হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার কোন বৈধ ছাড়পত্র নেই।

ইদানিং খোলা বাজারে গুড়ো দুধ, প্যাকেটজাত দুধ, পনির, ছানা যেভাবে বিক্রি হচ্ছে তার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই FSSI এর ছাড়পত্র নেই। অধিকাংশই নিম্নমানের ও ভেজাল খাবার।

আসুন জেনে নিই দুধে কি কি ভেজাল দেওয়া হয় এবং হাতে কলমে কীভাবে ধরবেন—

১. জল, অ্যারারুট, আটা, ময়দা, ভাতের মাড়, চিনি, বাতাসা ইউরিয়া প্রভৃতি মেশানো হয়। ল্যাকটোমিটার পাঠ ২৬°এর কম হলে বুঝতে হবে দুধে ভেজাল আছে। এই পাঠ ঠিক রাখতে ভাতের মাড়, অ্যারারুট ময়দা সহ বিভিন্ন স্টার্চ মেশানো হয়।

নমুনা দুধে টিংচার আয়োডিন বা আয়োডিন দ্রবণ মেশানো দ্রবণ নীলবর্ণ হবে। স্টার্চ আয়োডাইট তৈরি হবে। এর বর্ণ নীল।

২. দুধে বনস্পতি বা ডালডা মেশানো হয়। নমুনা দুধের ১০ মিলি নিয়ে ১ চামচ ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও ১ চামচ চিনি মিশিয়ে রাখলে দ্রবণটি লালবর্ণ হবে, বুঝতে হবে দুধে-বনস্পতি বা ডালডা আছে।

৩. ২০ মিলি দুধে সামান্য রোসালিক অ্যাসিড [$C_{19}H_{14}O_3$] মেশালে দুধের দ্রবণ যদি গোলাপী বর্ণ ধারণ করে তবে বুঝতে হবে দুধে সোডা বা ক্ষার জাতীয় পদার্থ মেশানো হয়েছে।

৪. দুধে ইউরিয়া [CH_4N_2O] ধরার উপায় :

১০ মিলি দুধে ১ চামচ অড়হর ডালের গুড়ো বা সোয়াবিনের গুড়ো মিশিয়ে ৫ মিনিট রাখলে যে দ্রবণটি পাওয়া যাবে, যেখানে লাল লিটমাস-এর রঙ নীলবর্ণ হবে। এক্ষেত্রে বুঝতে হবে দুধে ইউরিয়া আছে।

৫. দুধে চিনি বা বাতাসা মেশানো হয়। ৫ মিলি দুধে ২ মিলি ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সহ ৫০ মিগ্রা রিসরসিনল মিশিয়ে গরম করলে দ্রবণটির বর্ণ লাল হবে। এক্ষেত্রে বুঝতে হবে দুধে চিনি বা বাতাসা মেশানো হয়েছে।

কী কী ক্ষতি হয় : দুধে ভেজালের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক হল স্বাস্থ্যের ক্ষতি। ইউরিয়া মিশ্রিত দুধ আমদের শরীরে নানা রোগ ডেকে আনে যেমন কিডনির রোগ, ক্যানসার, সন্তান উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে। এছাড়া আর্থিক ক্ষতিতো আছেই।

ভ্রমণে পরিবেশ এবং বাংলার পাহাড়

প্রবীর বসু

পশ্চিমবঙ্গের পাহাড় ভ্রমণের মূল জায়গা দখল করে রেখেছে দার্জিলিং এবং তৎসংলগ্ন ডুয়ার্স অঞ্চল। এছাড়াও বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ছোট খাটো টিলা অধ্যুষিত অঞ্চলও পাহাড় প্রেমী পর্যটকদের কাছে তাদের নয়নের মণি। বছর ভর তারা ছুটে চলেছেন ঋতুভেদে পাহাড়ের সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে। তবে পরিচিত পাহাড়ী পর্যটন কেন্দ্রগুলি ভীড়ের চাপে বেসামাল। নিসর্গ পরিবেশ হারিয়ে গড়ে উঠেছে কংক্রিটের জঙ্গল। কাজেই প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ আশাহত হয়ে নতুনতর কোনো পরিবেশ বান্ধব বা পরিবেশমুখী পর্যটনের কথা ভাবছেন। এ-বিষয়ে ইউরোপের পরিবেশ বিজ্ঞানী Ceballos Lascurain ১৯৮৭ সালে Eco Tourism শব্দটি ব্যবহার করেন। এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, 'পর্যটন হবে তুলনামূলক ভাবে বিঘ্নহীন এলাকায় স্বাভাবিক প্রকৃতি পরিবেশকে একান্ত পরিদর্শন ও উপলব্ধির কামনায় ভ্রমণ'। ভীড়ের চাপে ক্লিষ্ট পর্যটক হোটেল ছেড়ে ঘরের অনুভূতি পেতে হলে থাকতে হবে ঘরেই— এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশের পাশাপাশি উপভোগ করতে চাইছেন গভীর নদী উপত্যকা, চঞ্চলা

নদীধারা, সবুজ পার্বত্য তৃণভূমি, সর্বোপরি, তুষার ধবল পর্বতচূড়া এবং এই পরিবেশে গড়ে ওঠা আকর্ষণীয় কৃষ্টি ও শিল্প-সংস্কৃতি সম্পন্ন বৈচিত্র্যময় জাতি উপজাতিকে নিয়ে গড়ে ওঠা পরিবেশ মণ্ডল। এই অপূর্ব নিসর্গ শোভা উপভোগ করতে প্রকৃতি প্রেমী পর্যটকের দল এগিয়ে চলেছে আরও গভীরে আরও নির্জনে প্রকৃতির কোল ঘেষে।

M : 9830676330

পরমাণু যুদ্ধ হলে

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট আমেরিকা জাপানের হিরোসিমা শহরে 'লিটল বয়' নামে পারমাণবিক বোমা ফেলল। সমগ্র বিশ্ব শিউরে উঠল এর বিধ্বংসী ক্ষমতা দেখে। এর তিন দিন পরেই 'ফ্যাট ম্যান' নামে আরেকটি বোমা ফেলা হল নাগাসাকি শহরে। দুটি বোমার ঘায়ে প্রায় দু'লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। সেই সঙ্গে শেষ হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আমেরিকার এই তাণ্ডবলীলার কথা আমাদের সকলেরই জানা। সেদিন সেই বোমার আঘাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ মানুষগুলির কথা স্মরণ করে আমরা প্রতি বছর ৬ আগস্ট হিরোসিমা দিবস পালন করি। প্রার্থনা করি পৃথিবীতে যুদ্ধ বন্ধ হোক। কিন্তু হয়েছে কী? বরং যেভাবে বিভিন্ন দেশ তাদের অস্ত্র সম্ভার বাড়িয়ে চলেছে তাতে ভবিষ্যতে আবার কোনো দেশে পারমাণবিক বোমা পড়বে না এমন গ্যারান্টি দেওয়া যাচ্ছে না।

১৯৪৫ সালে আমেরিকা ফাঁকা মাঠে গোল দিয়েছিল। তখন অন্য কোনো দেশের হাতে ওই বোমা ছিল না। এখন পরিস্থিতিটা অন্য রকম। এখন অনেক দেশের কাছেই পারমাণবিক বোমা আছে। তাই কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলবে না। ফলে পারমাণবিক বিস্ফোরণের পরিণাম হবে ভয়াবহ রকমের ধ্বংসাত্মক। তর্কের খাতিরে ধরা যাক, কোনো একটি দেশ অপর একটি দেশের উপর সাত হাজার মেগাটন বোমা ফেলল। বিস্ফোরণের পরেই যে শক ওয়েভ তাপ স্পন্দন (হিট পালসেশন) ও বিকিরণ সৃষ্টি হবে সেই আগুনে পুড়ে মারা যাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ, ধ্বংস হবে শহর ও অরণ্যানী। এত গেল প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক পরিণাম। পরোক্ষ বা বিলম্বিত পরিণাম হবে আরও মারাত্মক। আবহাওয়ায় সৃষ্টি হবে অবিশ্বাস্য পরিমাণ ধোঁয়া, বাষ্প, ভস্ম ও বিষাক্ত গ্যাসের মিশ্রণ। আয়নোস্ফিয়ারে পঁচিশ থেকে আড়াইশো মাইল ঊর্দ্ধাকাশে তৈরি হবে এয়ারোসেলের (এয়ারোসেল হল গ্যাসের মধ্যে ঝুলন্ত কঠিন বা তরল বস্তুকণা) মেঘ। স্ট্রাটোস্ফিয়ারে নয়-দশ মাইল ঊর্ধ্বলোক পর্যন্ত ধুলো-ধোঁয়ার মেঘ ছড়িয়ে পড়বে। এক সময় তা জমাট বেঁধে নিরেট হয়ে যাবে। এর ফলে বিকিরণ ব্যাহত হবে, সূর্য কিরণ পৃথিবীতে পৌঁছবে না। তাপমাত্রা দ্রুত হিমাঙ্কের নীচে নেমে যাবে। মনে করা যাক, অপর পক্ষ পাঁচ হাজার মেগাটন ফাটাল। কী হবে? নেমে যাওয়া তাপমাত্রার স্থায়িত্ব হবে দীর্ঘতর। পরিবেশের ক্ষতি হবে বিপর্যয়কারী। যুদ্ধের শেষে যারা তখন বেঁচে থাকবে তাদের অবস্থা হবে আরও করুণ। পরিবেশ দূষণ ও পারমাণবিক বিকিরণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে বিকৃত অবস্থায় কিছুদিন বেঁচে থাকলেও ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিপদ এখানেই থেমে থাকবে না। অগ্নিকাণ্ডের ফলে অলবিডো (অলবিডো হল চাঁদ বা মেঘ যেমন আলো ও তড়িৎ চুম্বক তরঙ্গ প্রতিফলন করে) ও প্রতিফলন ক্ষমতার ক্ষতি হবে। এতে পৃথিবীর সূর্যের তাপ শোষণ করার ক্ষমতা কমে যাবে। ফলে আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন ঘটবে। এই যুদ্ধে পৃথিবী থেকে যদি মনুষ্যজাতি সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই। মরে হেজে গিয়ে যে ক'টি তখনও বেঁচে থাকবে তাদের বর্তমান চেহারা ও মানসিকতা বদলে গিয়ে এক কিম্ভূতকিমাকার মানবজাতিতে পরিণত হবে। তবে এদের বেশির ভাগই বাঁচবে না। কারণ তারা না-পাবে ওষুধ পত্র, না-পাবে সাধারণ পথ্য পানীয়। এরা বংশ বিস্তারে সক্ষম থাকবে কিনা সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা সন্দিহান। তাঁদের অনুমান উলটে পালটে যাওয়া ওই দূষিত পরিবেশে ধুকপুক করা পঙ্গু প্রাণ ক'টির প্রজনন ক্রিয়া বিষদুষ্ট হয়ে পড়বে।

বোমার ঘায়ে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি যখন ধ্বংস হবে তখন তার ফল যে কী মারাত্মক হবে তার পরিচয় আমরা চেরনোবিল বা কয়েক বছর আগে ঘটে যাওয়ার জাপানে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদক রি-অ্যাকটারের দুর্ঘটনা থেকে জেনে গেছি। এর পরেও যুদ্ধক্ষেত্রে যদি আমরা পরমাণু বোমা নিক্ষেপ করি তাহলে এই গ্রহের পরিচয় হবে মৃত্যুপুরী।

পারমাণবিক বোমা যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আজ আমরা সকলেই ওয়াকিবহাল। এর অপকার সম্বন্ধে জানতে বাকি নেই কারোই। বিশ্বের ও বিশ্ববাসীর নিরাপত্তার জন্য আমাদের এখনই সংযত হওয়া উচিত। সব বোমা ধ্বংস করে ফেলা উচিত। তা না হলে, হয়তো একদিন বোমাই আমাদের খেয়ে ফেলবে।

E.mail : kbb.scwriter@gmail.com • M : 9433145112

হিরোসিমা শান্তি স্মৃতি মিউজিয়াম

নীলচে আলো

অনিন্দ্য দে

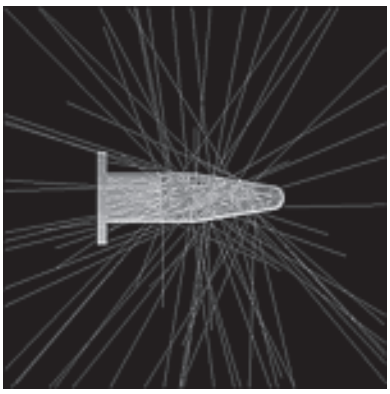

পরিষ্কার এক বোতল জল। সেই টলটলে জলের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন ভদ্রলোক। বোতলের জল থেকে একটা নীলাভ আলোর ছটা বেরিয়ে আসছে কেন? জলভরা বোতলটা অনেকক্ষণ তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মধ্যে রাখা ছিল। তাহলে এই নীলচে আলো কী সেই বিকিরণেরই কারসাজি? নিজের চোখকে আরও শাণিয়ে নেওয়ার জন্য ভদ্রলোক শুরু করলেন এক কঠোর সাধনা। দিনের কাজ শুরু করার আগে একঘন্টা করে কাটাতে লাগলেন পুরোপুরি অন্ধকার একটা ঘরে। তারপর অনবরত ওই হালকা নীল আলোর দিকে তাকিয়ে থাকা। শেষে ১৯৩৪ সালে পুরো ঘটনাটার বিবরণ দিয়ে লিখে ফেললেন একটা গবেষণাপত্র। ছেপে বেরনোর সাথে সাথেই হই চই শুরু হয়ে গেল এই পেপার নিয়ে। রাতারাতি সেলিব্রিটি হয়ে উঠলেন রাশিয়ান পদার্থবিদ পাভেল আলেক্সিভিচ চেরেনকভ।

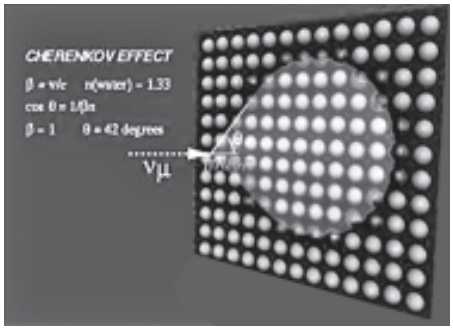

১৯৩৭ সালে ওই নীলচে আলোর উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করলেন পদার্থবিদ ইলিয়া ফ্র্যাঙ্ক আর ইগর ট্যাম। তারা দেখালেন কোনো মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে আধানযুক্ত কোনো কণা আলোর থেকে বেশি বেগে ছুটলেই একমাত্র এরকম নীল আলো দেখতে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু আমরা তো জানি এই মহাবিশ্বে আলোর বেগই সর্বোচ্চ বেগ, প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। তাহলে তার থেকে বেশি বেগে কণা ছুটবে কীভাবে? আসলে ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। আলো যখন ফাঁকা জায়গা দিয়ে যায় তখন তার বেগ ওই তিন লক্ষ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড। কিন্তু কোনও মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময়ে আলোর বেগ অনেকটাই কমে যায়। তাহলে তার থেকে বেশি বেগে কোনও কণা ছুটতেই পারে। তার মানে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ থেকে ছিটকে আসা আহিত কণা জলের মধ্যে দিয়ে ছুটে যাওয়াতেই দেখা গিয়েছিল ওই নীলাভ আলোর ছটা। চেরেনকভকে সম্মান জানিয়ে তাই এই ঘটনার নাম রাখা হল 'চেরেনকভ এফেক্ট'। ১৯৫৮ সালে চেরেনকভ পেলেন পদার্থবিদ্যার নোবেল, সঙ্গে অবশ্যই ট্যাম আর ফ্র্যাঙ্ক।

পদার্থবিদ্যার নানা ক্ষেত্রে এই চেরেনকভ এফেক্টকে কাজে লাগানো হয়েছে। কিন্তু ক্যান্সার চিকিৎসাতেও যে একে কাজে লাগানো সম্ভব সেটা এতদিন আমাদের জানা ছিল না। জানালেন স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নিকোলে একারম্যান। জীবদেহের ক্যান্সার আক্রান্ত কোশগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করার একটা নতুন উপায় বের করেছেন একারম্যান আর তার সহযোগীরা। তারা এই পদ্ধতিটার নাম দিয়েছেন 'চেরেনকভ লাইট ইমেজিং'।

আসলে ক্যান্সার আক্রান্ত কোশগুলোকে চেনার জন্য দরকার পড়ে একটা উপযুক্ত অ্যান্টিবডির। চিকিৎসকের কাজ গ্লুকোজের সঙ্গে ওই অ্যান্টিবডিকে জুড়ে দিয়ে ক্যান্সার আক্রান্ত কোশগুলোতে পৌঁছে দেওয়া। ক্যান্সার আক্রান্ত কোশ যেহেতু খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, তাই তাদের প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজের দরকার হয়। ফলে অ্যান্টিবডি আর গ্লুকোজের সিস্টেমটা খুব তাড়াতাড়ি ক্যান্সার আক্রান্ত কোশের ঘাড়ে চেপে বসতে পারে। একারম্যান আর তার দলবল ফন্দি আঁটলেন 'তেজস্ক্রিয় গ্লুকোজ' বানানোর। তার জন্য একটা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপকে (অ্যাক্টিনিয়াম-২২৫) তারা গুঁজে দিলেন ওই গ্লুকোজ অনুর ভিতরে। এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের বিঘটনে যে নেভেটিভ চার্জের বিটা কণা বেরিয়ে আসে সেটা আগেই জানা ছিল। আর জীবদেহের কোশ-কলার বেশির ভাগ অঞ্চলই যে জলে ভরা সে আমাদের সবারই জানা। সুতরাং জলের মধ্যে দিয়ে নেগেটিভ চার্জের

বিটা কণাগুলো যাওয়ার সময়ে বেরিয়ে আসবে চেরেনকভের সেই নীল আলো। ওই নীল আলোতে ক্যান্সার আক্রান্ত অঞ্চলের ছবি তুলে রাখার ব্যবস্থাও হল। অ্যান্টিবডি আর তেজস্ক্রিয় গ্লুকোজের সিস্টেমের সঙ্গে একারম্যান জুড়ে দিলেন ছোট্ট একটা ক্যামেরা, যার পোষাকি নাম 'চার্জড্ কাপ্‌ল্‌ড ডিভাইসেস', সংক্ষেপে 'সি সি ডি'।

পুরো ব্যাপারটার কার্যকারিতা দেখার জন্য একারম্যান আর তার সহকর্মীরা মানুষের দেহের ক্যান্সার আক্রান্ত কিছু কোশ ঢুকিয়ে দিলেন কয়েকটা ইঁদুরের শরীরে। এবারে ওই তেজস্ক্রিয় গ্লুকোজকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল ইদুরগুলোর শরীরে। একারম্যান দেখালেন যে তিন মিনিটের মধ্যেই ইদুরের দেহে চার থেকে পাঁচটা ক্যান্সার আক্রান্ত কোশকে চেনা যাচ্ছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আক্রান্ত কোশগুলোকে চিনে নেওয়ার এই ব্যাপারটাই সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। একারম্যানের দাবি, ক্যান্সারের শিকার কোনো রোগীর অপারেশন চলাকালীনই ডাক্তারবাবু দেখে নিতে পারবেন রোগীর শরীরের আর কোনো ক্যান্সার কোশ আছে কী না। কত তাড়াতাড়ি এই পদ্ধতি দুরারোগ্য ক্যান্সার চিকিৎসায় ব্যবহার করা শুরু হবে এখন শুধু তার অপেক্ষাতেই অধীর আগ্রহে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকা।

E.mail : anindya05@gmail.com • M : 9432220412

সভ্যতার আতঙ্ক : প্লাস্টিক ও থার্মোকল

ডঃ তপন দাস

রোজকার মতো সেদিন বেরিয়েছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়ার জন্য কোচবিহারের সাগরদিঘির পাড়ে। বিশুদার দাদার হঠাৎই অকাল প্রয়াণ হয়েছে। কি হয়েছে জানতে চাইলে বিশুদা বলল বেশ কয়েক মাস ধরেই ওর দাদা হৃদরোগে ভুগছিলেন, সঙ্গে ডায়াবেটিস। এটুকু বলেই বিশুদা বেরিয়ে গেল। আজকাল প্রায় প্রত্যেক ঘরেই শোনা যায়, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, কিডনীতে স্টোন, আবার কারও বাড়িতে একজন ক্যানসারে আক্রান্ত। এসব রোগের প্রাদুর্ভাব বেড়ে যাওয়ার পিছনে নির্দিষ্ট একটি কারণ না থাকলেও অন্যতম একটি কারণ প্লাস্টিক ব্যবহার।

সভ্যমানুষ আরো আধুনিক হতে গিয়ে মাটির পাত্র, কাচের পাত্র ব্যবহার করে না, এমনকি ধাতব পাত্রের ব্যবহারও কমিয়ে দিয়েছে। রান্নাঘরের অনেক জায়গায়ই (যেমন কাপ, প্লেট, থালা, গ্লাস, জলের বোতল) প্লাস্টিক দখল করে নিয়েছে। অন্যদিকে শিশুর খেলনা, ঔষধের মোড়ক, গৃহসজ্জার সামগ্রী সর্বত্রই প্লাস্টিক ছাড়া চলে না। কর্মব্যস্ত মানুষ ব্যস্ততার মাঝে বাজার সারছে প্লাস্টিকের ব্যাগে, যেখানে গরম খাবারই হোক আর কই মাছই হোক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই বিভিন্ন ধরনের পলিমার আবিষ্কৃত হওয়ায় তাদের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কৃত্রিম পলিমার নির্মিত বস্তু দেখতে সুন্দর ও দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় দিনে দিনে এর চাহিদা বাড়ছে।

কিন্তু প্লাস্টিকের ব্যবহার আমাদের পরিবেশকে দূষিত করে তুলছে বিভিন্ন ভাবে। জৈব অভঙ্গুর হওয়ায় এরা মাটিতে মিশছে না, অর্থাৎ অনুজীব প্লাস্টিককে ভেঙে মাটিতে মেশাতে পারছে না। তাই স্তূপাকারে জমা থেকে জলনিকাশী ব্যবস্থার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। মাটির উর্বরতা শক্তি কমিয়ে দিচ্ছে। আবার এদেরকে পোড়ালে উৎপন্ন হচ্ছে অনেক বিষাক্ত গ্যাস। এখানে কয়েকটি প্লাস্টিকের উপাদান ও তাদের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো আলোচনা করা হল।

(ক) পলিভিনাইলক্লোরাইড (PVC) : দৃঢ় এবং নমনীয় এই পলিমারটি দিয়ে শিশুদের খেলনা থেকে শুরু করে জলের পাইপ অনেক কিছুই তৈরি হয়। PVC এর মধ্যে থাকে থ্যালেট (Phthalate) যাকে বলে DEHP এবং dioctyl phthalate। এই থ্যালেটের আছে হরমোন অনিয়মিত নিঃসরণের ধর্ম। তাই অনেক দেশেই এটা নিষিদ্ধ। বিকল্প হিসাবে যে রাসায়নিক পদার্থটি আছে সেটি হল DiNP, যার মধ্যেও কিন্তু কিছুটা 'Hormone Disruption' বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে আছে। এছাড়াও আছে, Lead, Cadmium-এর মতো বিষাক্ত পদার্থ।

(খ) নিম্নঘনত্ববিশিষ্ট পলিইথিলীন (LDPE) : এই পলিমারটি সাধারণত, দুধের কার্টনের ব্যাগ, বেকারি সামগ্রীর প্যাকেট তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের পলিমারে বিষাক্ত কিছু না থাকলেও এটা ইস্ট্রোজেনিক (estrogenic chemicals) ক্যামিক্যালস্ নিঃসৃত করে।

(গ) উচ্চঘনত্ববিশিষ্ট পলিমার (HDPE) : এই পলিমার দিয়ে দুধের বোতল, শ্যাম্পুর বোতল, ডিটারজেন্টের বোতল ইত্যাদি তৈরি হয়। এটার ব্যবহার নিশ্চিন্ত বলা হলেও ইস্ট্রোজেনিক রাসায়নিক নিঃসরণ করে যা শিশু বা কিশোরদের নিঃশব্দে ক্ষতি করে চলেছে। এতে nonylphenol থাকে যা একটি endocrine disruptor। অর্থাৎ হরমোনের স্বাভাবিক কাজে ব্যাঘাত ঘটায়।

(ঘ) পলিইথিলীন টেরিথ্যালেট (PET) : বহুল ব্যবহৃত এই প্লাস্টিক খাবার এবং পানীয় দ্রব্যাদি প্যাকেট জাত করতে দেখা যায়।

এই প্ল্যাস্টিকে প্যাকেটজাত খাদ্যদ্রব্য বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসতে পারে না। তাই অনেকদিন টাটকা থাকে। কিন্তু এই পলিমার বানাতে ব্যবহৃত হয় পলিএস্টার যা জামাকাপড় থেকে শুরু করে কার্পেট, টায়ার, সেফ্টিবেল্ট সর্বত্রই পাওয়া যায়, তা কিছুদিনের মধ্যেই অ্যান্টিমনি নিঃসরণ করতে থাকে। অ্যান্টিমনি ট্রাইঅক্সাইড একটি কার্সিনোজেনিক (ক্যানসার সৃষ্টিকারী) পদার্থ। তাহলে বোঝাই যাচ্ছে এটা ব্যবহার কতটা নিরাপদ।

(ঙ) Polypropylene (PP) : সস্, জেলি, বাটার, মারজারিন মেডিসিনের বোতল, স্ট্র, বেবি বোতল, স্যানিটারী প্যাড প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের প্লাস্টিকের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয় Oleamide, যা হাঁপানী (Asthma) রোগের জন্য দায়ী।

(চ) পলিকার্বোনেট (PC) : বেবি বোতল থেকে শুরু করে জলের ট্যাঙ্ক অনেক কিছুই বানানো হয় এই পলিমার দিয়ে। এর অন্যান্য ট্রেড নামগুলো হল Makrolon, Lexan ইত্যাদি। এই প্লাস্টিকের ভাঙনে

উৎপন্ন হয় bisphenol A (BPA) যা অত্যন্ত ক্ষতিকারক একটি পদার্থ। বিশেষ করে বিভিন্ন রকমের হরমোন (estrogen) নিঃসরণে ব্যাঘাত ঘটায়।

(ছ) পলিস্টাইরিন (থার্মোকল) : ফিনাইল ইথিলীন (stryrene) এর পলিমারাইজেনের মাধ্যমে পলিস্টাইরিন যা থার্মোকল নামে পরিচিত প্রস্তুত করা হয়। আজ আমরা সাধারণ প্লাস্টিক নিয়ে কিছুটা সচেতন হলেও থার্মোকলের ব্যাপারে অনেকটাই উদাসীন। তাই ডেকোরেশানের কাজ থেকে শুরু করে থার্মোকলের থালা, বাটি গ্লাস ইত্যাদি অনেক জায়গাই দখল করে নিয়েছে এই থার্মোকল। যেকোনো অনুষ্ঠানে অবলীলায় এর ব্যবহার চোখে পরার মতো। সাধারণ প্লাস্টিকের মতো এটাও জৈব অভঙ্গুর। জল, কাদা বা প্যাথোজেনেও এর ভাঙন দেখা যায় না। আবার

স্তূপাকারে জ্বালিয়ে দিলে নির্গত হয় প্রচুর বিষাক্ত গ্যাস যা শ্বাসকষ্ট থেকে শুরু করে হৃদরোগ সবকিছুর জন্যই অনেকাংশে দায়ী।

আধুনিক সভ্যতায় জড়িয়ে পরা মানুষ আজ আর প্লাস্টিক ছাড়া চলতেই পারবে না। একদিকে যেমন পাটজাত দ্রব্যাদি মানুষ আর ব্যবহার করতেই চাইছে না, আবার কাচের তৈরি জিনিসের ব্যবহারও কমিয়ে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা তাই প্লাস্টিকের বিকল্প হিসাবে বিকল্প প্লাস্টিককেই বেছে নিয়েছে। উন্নততর প্লাস্টিক উৎপাদনের কয়েকটি উপাদানের কথা নিম্নে আলোচনা করা হল— জৈববিনাশী স্টার্চযুক্ত প্লাস্টিক biopol, পলিইথিলীন অ্যাডিপেট-কো-টেরিথ্যালেট, পলি ল্যাকটিক অ্যাসিড (PLA) যা dextrose থেকে উৎপন্ন করা হয়, পলিহাইড্রোক্সি বিউটাইরেট (PHB), পলিগ্লাইকো অ্যাসিড প্রভৃতি পলিমারগুলো প্রায় জৈব ভঙ্গুর। কিন্তু এদের ভাঙনে বিশেষ কোনো ক্ষতিকারক পদার্থ উৎপন্ন হয় না বললেই চলে।

তাছাড়া Podegrant Concentrate (PDC) যেমন, কোবাল্ট স্টিয়ারেট, ম্যাঙ্গানিজ স্টিয়ারেট যারা দ্রুত জারণ ক্রিয়ার মাধ্যমে

প্লাস্টিককে ভঙ্গুর করে তোলে। তাছাড়া দুধ থেকে প্রাপ্ত মুখ্য প্রোটিন 'Casein' দিয়ে তৈরি প্লাস্টিক যা পলিস্টাইরিনের মতোই শক্তও দৃঢ় যা একটি জৈব ভঙ্গুর প্লাস্টিক। এ সমস্ত পদার্থ ছাড়াও মুরগীর পালক থেকে প্রাপ্ত কেরাটিন জাতীয় প্রোটিনও মিথাইল অ্যাক্রাইলেটের সঙ্গে মিশিয়ে জৈব ভঙ্গুর প্লাস্টিক তৈরি করা সম্ভব। D2W (Degradable to Water) প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্লাস্টিককে এমন আনবিক গঠনে পরিণত করা সম্ভব যা খুব সহজেই জৈব ভঙ্গুর হবে এবং খুবই সামান্য CO_2, H_2O-এর সঙ্গে হিউমাসে পরিণত হবে। এই পদ্ধতিতে কোনো বিষাক্ত গ্যাস বা মিথেন উৎপন্ন হয় না।

সর্বোপরি নিজেদেরকে সুস্থ রাখার লক্ষ্যে বা নিজের পরিবেশকে সতেজ রাখার লক্ষ্যে আমাদের উচিৎ বিকল্প প্লাস্টিককে খুঁজে নেওয়া। প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে চিরাচরিত জিনিসের ব্যবহার বাড়ানো। পুনঃব্যবহার যোগ্য জিনিসের ব্যবহার করা। আসুন সকলে মিলে পরিবেশকে সতেজ করি। জীবকুলের অস্তিত্বকে রক্ষা করি।

E.mail : tdcob25@gmail.com • M : 9434686749

প্রিয় পাঠক

- *পত্রিকার জন্য আপনিও লেখা পাঠাতে পারেন। বিজ্ঞান অনুসন্ধানী অপ্রকাশিত লেখা পাঠান।*
- *পত্রিকার সমালোচনা, পরামর্শ, গুণমান বিষয়ে অপানার সুচিন্তিত মতামত সাদরে গ্রহণ করব।*
- *বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংক্রান্ত কাজের খবরাখবর ছবিসহ মেল করে পাঠান।*
- *পত্রিকার গ্রাহক হোন। বছরে ছ'টি সংখ্যার গ্রাহক চাঁদা তিরিশ টাকা। ডাকযোগে আপনার বাড়িতে পত্রিকা পাঠিয়ে দেব আমরাই।*

‘শূন্য’তে আসা

অঙ্কিতা সেনগুপ্ত

‘গণিত সেই ভাষা যা দিয়ে ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেছেন’

—গ্যালিলিও গ্যালিলি

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে তা লেখা হয়েছে গণিতের ভাষায়। আর যা কিছু নেই তার বেলা? মজার কথা এই যে, যা কিছু নেই তাও গণিতে হেলাফেলার বস্তু নয়। তাই যা কিছু নেই তাকেও প্রকাশ করা হয় ছোট্ট একটি চিহ্ন ‘0’ বা ‘শূন্য’-র মাধ্যমে।

অবশ্য এই ‘কিছু না’-র মূল্যকে কখনোই ‘কিছু না’ বলা যায় না। এখানে মজার একটা উদাহরণ দিই : ধরা যাক, তোমার কাছে 100 টাকা আছে। তোমার বন্ধু বলল যে, সে তোমার কাছ থেকে একটা ‘0’ নিয়ে তোমাকে দিল 10 টাকা। সত্যিই তো, 100 থেকে একটা ‘0’ সরালে তো ‘10’ই হয় কিন্তু সেই শূন্য সরাতে গিয়ে তুমি হারালে 90 টাকা।

বড়ো আশ্চর্য এই ‘শূন্য’। স্থানীয় মানে বিস্তারের অঙ্ক করতে গিয়ে শূন্য নিয়ে অনেক কাজই তো আমরা করেছি। যেমন : $2014 = 2\times1000+0\times100+1\times10+4$। মজার কাণ্ড কোনো সংখ্যার বামদিকে যতই শূন্য বসাই তার মান পরিবর্তিত হবে না।

যেমন : $7.34 = 0007.34$ বা $203 = 0203$

কিন্তু যদি ডানদিকে শূন্য বসানো হয়, $10 \neq 100$

আবার দশমিক সংখ্যার বেলায়, $9.34 = 9.340000$

কিন্তু $9.34 \neq 9.034$

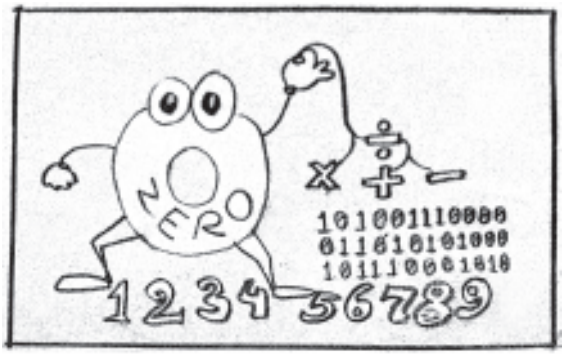

স্কেচ : সৌরভ মুখার্জী

শূন্যের এই অপার মহিমার আরেকটা উদাহরণ দিই :

1 এর পিছনে 100টা শূন্য খাতায় লেখা বেশ কষ্টকর, তাই সহজে লেখা যায় 10^{100}— এই সংখ্যাই হল ‘গুগল্’। তাহলে 1 এর পিছনে ‘এক গুগল্’ শূন্য বসালে কী হবে? সংখ্যাটিকে বলা হয় ‘গুগলপ্লেক্স’ অর্থাৎ $10^{(10^{100})}$ অথবা $10^{\text{গুগল্}}$।

একটা বই যাতে 400টি পাতা আছে, প্রতি পাতায় 50টি লাইন ও প্রতি লাইনে 50টি শূন্য লেখা যায়, তার ভর যদি 100 গ্রাম হয়, তাহলে ‘এক গুগল্‌প্লেক্স’ সংখ্যাটি লিখতে এরকম 10^{94}টি বই লাগবে যার মোট ভর হবে 10^{93} কিলোগ্রাম আর আমাদের মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সি’র ভর 2.5×10^{42} কিলোগ্রাম। কোনটা বেশি হল? আসলে এই সংখ্যা লেখার জন্য পর্যাপ্ত স্থান আমাদের চেনা ব্রহ্মাণ্ডে অন্তত নেই। অথচ সংখ্যাটায় একটা ‘1’ ছাড়া সবই তো ‘0’।

এহেন প্রবল প্রতাপময় শূন্যের ব্যবহার কিন্তু খুব বেশি সময়ের ঘটনা নয়, যদিও ‘empty’ বা ‘কিছু নেই’-এর ধারণা অনেক দিনের। প্রাচীন ব্যবিলনীয়রা ‘শূন্যস্থান’ বোঝাতে তিনটে হুক ব্যবহার করত। ‘দশ’ প্রকাশিত হোত ‘<’ চিহ্নের মাধ্যমে। অন্যদিকে 2000 বছর আগে আগে গ্রীক গণিতজ্ঞরা A, I, /A প্রভৃতির দ্বারা যথাক্রমে ‘1’, ‘10’, ‘1000’ বোঝাত। রোমানরা ‘1’, ‘10’, ‘100’ ‘1000’ প্রভৃতি ব্যবহার করত যথাক্রমে I, X, C, M প্রভৃতি। কিন্তু কোথাও সংখ্যা হিসেবে ‘শূন্য’-এর ব্যবহার চোখে পরে না। অন্যদিকে 1300 বছর মায়া সভ্যতা ‘খোল’ আকৃতি দিয়ে ‘শূন্য’ বোঝালেও কোনো সংখ্যাকে স্থানীয় মানে বিস্তারের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার দেখা যায় না।

বর্তমানে ব্যবহৃত ‘Place Value System’-এর প্রকৃত সূত্রপাত ঘটে প্রাচীন ভারতে। আর্যভট্ট তাঁর গ্রন্থ ‘আর্যভটিয়াম’-এ লেখেন ‘স্থানম্ স্থানম্ দশ গুণম্’ অর্থাৎ ‘স্থান থেকে স্থানে দশ গুণ বৃদ্ধি’। অর্থাৎ সংখ্যায় কোন অংকের স্থানই তার মান নির্ণয় করবে। এমতাবস্থায় সংখ্যায় ‘শূন্যস্থান’-এর ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শুরু হয় ‘শূন্য’-র যাত্রা শুধুমাত্র চিহ্ন হিসেবে। প্রাচীন ভারতীয় লিপিতে ‘শূন্যস্থান’ বোঝানোর জন্য ‘·’-এর ব্যবহার দেখা গেছে। ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম সংখ্যা হিসেবে ‘শূন্য’কে ব্যাখ্যা করেন ব্রহ্মগুপ্ত। তাঁর ‘ব্রহ্মস্ফুতসিদ্ধান্ত’ গ্রন্থে তিনি শূন্যর সাথে যেকোন সংখ্যার যোগ, গুণ; শূন্য থেকে যেকোনো সংখ্যার বিয়োগ; সংখ্যাগুলির মধ্যে যোগ অথবা বিয়োগের মাধ্যমে শূন্যের অবতরণ ইত্যাদি নিয়মগুলি লেখেন। এছাড়া ঋণাত্মক সংখ্যারও ধারণা দেন। তবে অসম্পূর্ণ থেকে যায় শূন্য দিয়ে কোন সংখ্যাকে বিভাজনের ধারণা। পরবর্তীকালে ভাস্কর সিদ্ধান্ত দেন— ‘শূন্যের বর্গ ও বর্গমূল শূন্য। শূন্য নিয়ে গবেষণা চলতে থাকে। আরবীয় গণিতজ্ঞদের হাত ধরে প্রাচীন ভারতীয় মনীষীদের অমূল্য জ্ঞান এসে পৌঁছায় ইউরোপে। ততদিনে সংস্কৃত ‘শূন্য’ হয়েছে আরবীয় ‘আল-সিফার’ ও চৈনিক গণিতেজ্ঞা ‘0’ চিহ্নের ব্যবহারও শুরু করেছেন। 1200 শতকে ফিবোনাক্কি ‘শূন্য’কে ব্যাখ্যা করেন ও নাম দেন ‘সিফ্‌রা’। পরে রেনে ডেসকার্টেস ‘Cartesian Coordinate System’-এ মূলবিন্দু হিসেবে ব্যবহার করেন (0, 0)।

শূন্য নিয়ে যোগ, বিয়োগ, গুণের ধারণা স্পষ্ট হলেও অসম্পূর্ণ ছিল বিভাজনের ব্যাখ্যা। শূন্য দিয়ে কোনো সংখ্যাকে ভাগ করলে ভাগফল হবে ‘অসংজ্ঞাত’ যে চাবি দিয়ে নিউটন ও লিবনিজ খুলে দেন গণিত জগতের আরেক দরজা— ‘ক্যালকুলাস’। অন্যদিকে বিভিন্ন দেশ ঘুরে ‘সিফ্‌রা’ পরিবর্তিত হয় ‘Zero’-তে।

আজ ‘O’ আমাদের কাছে অতি পরিচিত সংখ্যা। যার অনেক নাম, অনেক প্রতীক। গণনা থেকে ডিজিট্যাল জগৎ, বিগ-ব্যাং থিওরি থেকে বীজগণিত-কোথায় নেই এর ব্যবহার। কিন্তু ভাবতেও অবাক লাগে যে, কত গণিতজ্ঞের কত দিনের নিরলস পরিশ্রম গড়ে তুলেছে আজকের ‘0’কে যার অস্তিত্বহীনতা পার করে ব্রহ্মাণ্ডের চেনা গণ্ডি।

তাই বলাই যায়— শূন্য ছাড়া সৃষ্টি অপূর্ণ, গণিত কল্পনাতীত।

E.mail : ankitasengupta57@gmail.com • M : 9748685280

‘একটি আষাঢ়ে গোয়েন্দা গল্প ও ফেলু মিত্তির’-এর উত্তর

ড: শৈবাল ঘোষ

দুটি ছক (Matrix) নেওয়া হল নিচের মত (এখানে E = ইঞ্জিনিয়ার, G = গার্ড, D = ড্রাইভার, S = সোদপুর, H = হালিশহর, B = ভাটপাড়া, আকাশ = AK, অতনু = AT, অমিতাভ = AM এবং যাত্রীদের নামের আগে Mr. লেখা হল তাঁদের আলাদা করার জন্য)।

	E	G	D
AK	(১,১)	(১,২)	(১,৩)
AT	(২,১)	(২,২)	(২,৩)
AM	(৩,১)	(৩,২)	(৩,৩)

ছক—১

	S	H	B
Mr. AK	(১,১)	(১,২)	(১,৩)
Mr. AT	(২,১)	(২,২)	(২,৩)
Mr. AM	(৩,১)	(৩,২)	(৩,৩)

ছক—২

ছক দুটির প্রতিটি ঘরে ১ লেখা হবে যদি তা যুক্তিগ্রাহ্য হয় ও ০ লেখা হবে যদি সেটা জানা তথ্য অনুযায়ী বাতিল হয়। এবার দেখা যাক, এটা কিভাবে কাজ করবে।

৭ নং তথ্য (clue) অনুসারে, আকাশ (AK) ড্রাইভার (D) নয়; কাজেই ১ম ছকের (১,৩) ঘরে ০ লেখা হল। আবরা, ২ নং তথ্য অনুসারে, ২য় ছকের (৩,১) ঘরে ১ লেখা হল এবং (৩,২), (৩,৩), (১,১), (২,১) ঘরে ০ লেখা হল, ১ নং তথ্য অনুসারে।

	E	G	D
AK		০	০
AT	০	১	০
AM	০	০	১

ছক—১

	S	H	B
Mr. AK	০	১	০
Mr. AT	০	০	১
Mr. AM	১	০	০

ছক—২

৩ নং ও ৬ নং অনুযায়ী, যিনি অঙ্কই করতে পারেন না, তিনি হালিশহর-এ থাকেন। কিন্তু তিনি কে? ইনি Mr. AM নন, আবার Mr. AT (যিনি পদার্থবিদ)-ও নন। অতএব, উনি Mr. AK। কাজেই, ২ নং ছকের (১.২) ঘরে ১ এবং (১,৩), (২,২) ঘরে ০ লেখা হল। অতএব, Mr. AT ভাটপাড়াতে থাকেন, ফলে ২ নং ছকের (২,৩) ঘরে ১ লেখা হল।

এখন, ৫ নং তথ্য থেকে এটা পরিস্কার গার্ডের নাম অতনু। তাই আমরা ১ নং ছকের (২,২) ঘরে ১ ও (১,২), (৩,২), (২,১), (২, ৩) ঘরে ০ লিখলাম। বাকিটা সোজা— D-এর স্তম্ভে বাকি ঘরটায় আমরা ১ লিখতে বাধ্য। ফলে ড্রাইভারের নাম অমিতাভ। ১ নং ছকের (৩,১) ঘরে স্বাভাবিক ভাবে ০ বসবে, অতএব (১,১) ঘরে ১ হবে। অর্থাৎ আকাশ হল ইঞ্জিনিয়ার।

E.mail:cool.soibal@rediffmail.com • M : 9432648313

পাখিদের শরীরচর্চা

সম্রাট সরকার

পাখিদের দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে বেশির ভাগ সময় দখল করে থাকে খাদ্যানুসন্ধান। তারপর বিশ্রাম। বাকি সময়টুকু কাটে তাদের শরীরচর্চা করে। তবে প্রজাতি, ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়ার তারতম্য, ঋতু ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে তাদের এই রুটিন কাজকর্মের পরিবর্তন ঘটতেই পারে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে শরীরচর্চা পাখিদের জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। পাখিরা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি শারীরিক। তাদের বেঁচে থাকার প্রত্যেক মুহূর্তে শারীরিক সক্ষমতার প্রয়োজন।

পাখিদের শরীরচর্চা মূলত দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। পাখির পালকের পরিচর্যা বা Preening এবং ব্যায়াম বা Stretching।

১। পালকের পরিচর্যা বা preening ঃ পালক পাখির অনেক শরীরবৃত্তিয় কর্মকান্ডের অংশীদার। যেমন প্রজনন, উড়ান, তাপসহনশীলতা ইত্যাদি। প্রধানত উড়ানের জন্য পাখি তার পাখনার পালক নিয়মিত তৈরি রাখে। ডানার পালকগুলি যাতে সঠিক অভিমুখে থাকে এবং যেকোনো রকম জটমুক্ত থাকে তার জন্য তাঁকে ঠোঁট দিয়ে পালকগুলিকে আঁচড়াতে হয়। পালকে যাতে কোন উকুন বা মাছি বাসা বাঁধতে না পারে তা দেখতে হয়। পালকে যাতে preen oil-এর ঘাটতি না থাকে তার জন্য preen oil গ্রন্থি থেকে তেল ঠোঁটে করে নিয়ে সমস্ত পালকে মাখাতে হয়। Preen oil পালককে জলনিরোধক করে তোলে।

২। ব্যায়াম বা Stretching ঃ শারীরিক ভাবে চূড়ান্ত সক্ষম থাকার জন্য পাখিকে ব্যায়াম করতেই হয়। ব্যায়াম শরীরের প্রতিটি পেশিতে রক্তসঞ্চালন বাড়ায়। পেশিগুলি টানটান ও সক্ষম থাকে।

ছবির পাখিটার নাম সাদা খঞ্জনা। ইংরাজিতে White Wagtail। সাদা খঞ্জনার এই উপজাতিটা মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম এশিয়ায় প্রজনন করে। শীতকালে আমাদের রাজ্যে প্রচুর সংখ্যায় আসে। শোনা যায় প্রবাসে যে অঞ্চলে তারা থাকে সেখান থেকে সর্বোচ্চ ৩০ কিমি দূরত্ব পর্যন্ত খাবারের খোঁজে যায় এবং ফিরে আসে। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে তাদের প্রবাসে আসা, আবার শীতের শেষে ফিরে যাওয়া, খাবারের খোঁজে দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া সত্যিই চূড়ান্ত শারীরিক সক্ষমতা দাবি করে। তার জন্য খঞ্জনাকে নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হয়।

প্রত্যেক বছর শীতে আমাদের গ্রামে ওদের দেখি চাষের মাঠগুলোতে। সকাল থেকে সন্ধ্যে ফুরসত পেলেই শরীর পরিচর্যায় ব্যস্ত। কখনো পাখনার সঙ্গে পা প্রসারিত করে, কখনো মাথা নিচু করে লেজ উপরে তুলে, কখনো ডানা-দুটো উপরের দিকে প্রসারিত করে ব্যায়াম করে চলেছে। মাঝে মাঝে ঠোঁট দিয়ে পালক পরিস্কার। আমাদের চিরাচরিত আসনগুলোর সঙ্গে কত মিল। যে আসনগুলো আমরা ছোটোবেলায় স্কুলে স্যারেদের কাছে শিখতাম। বড় হয়ে সেসব বেমালুম বাদ দিয়ে আজ সামান্য দোতলার কুড়িটা সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে ঘেমে নেয়ে একসা।

E.mail:samratswagata11@gmail.com • M : 9433962227

সংবাদ

প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা ও কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে বিজ্ঞান সংগঠনগুলির যৌথ সম্মেলন

আগামী ২০ আগস্ট, ২০১৭, রবিবার সকল ১০টা থেকে বিকেল ৫.১০ মিনিট পর্যন্ত রবীন্দ্রকক্ষে, (চাকদহ পৌরসভার পাশের গলি), বিজ্ঞান সংগঠন গুলি যৌথ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ সমস্ত বিজ্ঞান ও পরিবেশ কর্মীরা উপস্থিত থাকবেন এই সম্মেলনে। ১ম পর্যায়ে শব্দদূষণ (মাইক, ডিজে ও শব্দবাজি দূষণ) নিয়ে আলোচনা হবে। পরবর্তী পর্যায়ে জলাভূমি, নদী, গাছ ও প্রকৃতি সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা হবে। আপনারা অবশ্যই এই সম্মেলনে আসুন।

মশা তাড়ানোর ভেষজ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনাসভা

মশা তাড়ানোর জন্য বাজারের যে কোন কয়েলই স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ ক্ষতিকারক। একথা আমরা সকলেই জানি। অথচ মশা তাড়ানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হল ভেষজ পদ্ধতির সাহায্যে নেওয়া। বিজ্ঞান দরবারের উদ্যোগে ১০ জুন, ২০১৭ বিজ্ঞান দরবারের কার্যালয়ে মশা তাড়ানোর ভেষজ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন সেফ (সেভিয়রস অ্যান্ড ফ্রেন্ড অফ এনভায়রনমেন্ট) এর অধিকর্তা সুদীপ্ত ভট্টাচার্য।

যমুনা নদী ও জলাশয় নিয়ে সেমিনার

ফতেপুর হাইস্কুলে ১৯ জুন বিপন্ন যমুনা নদী ও পাখি নিয়ে আলোকচিত্র সহ এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রধান শিক্ষক সুদিন ভট্টাচার্য বলেন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসারের জন্য এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভায় অনুপ হালদার এবং সম্রাট সরকার আলোকচিত্র সহ বক্তব্য রাখেন।

সেমিনার ঃ জলাশয় ও আর্সেনিক দূষণ

৮ জুলাই বিজ্ঞান দরবারের কার্যালয়ে আর্সেনিক দূষণ ও জলাশয় নিয়ে আলোকচিত্র সহ বক্তব্য রাখেন জয়দেব দে ও অনুপ হালদার।

বৃক্ষ নিধন ও আন্দোলন

সারা রাজ্যজুড়ে বৃক্ষ নিধন চলছে। বাদ নেই উত্তরবঙ্গও। বক্সা অরণ্যে রাজাভাতখাওয়া থেকে সান্তালবাড়ি ও জয়ন্তী অবধি চলছে রাস্তা চওড়া, পিচ ঢালার কাজ। দুদিক তাকালে দেখা যাবে জঙ্গল অনেকটাই ফাঁকা। কুচবিহার শহর ছাড়িয়ে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের দুপাশে বিশাল বিশাল মহীরূহ অনন্ত ছায়া মেলে ধরে রয়েছে পথচারী, পশুপাখিদের উপর। রাস্তা সম্প্রসারণের নামে পি ডব্লিউ ডি এই গাছগুলি কেটে কাঠ বিক্রি করে দিচ্ছে। আধুনিক পদ্ধতিতে এগুলোকে সরানো যেত।

গরুমারার ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া মালবাজার-চ্যাংড়াবান্ধা সিঙ্গল রেললাইন। যেখানে সড়ক রাস্তায় মিশেছে সেখানে ফ্লাই ওভার তৈরির উদ্দেশ্যে একরাত্রে সুপরিকল্পিত ভাবে মূল্যবান গাছ যন্ত্র দিয়ে কেটে সরিয়ে দেওয়া হল। আন্দোলনে সামিল হলেন পরিবেশপ্রেমী গণতান্ত্রিক মানুষজন। তারা শান্তিপূর্ণ অবস্থান শুরু করলেন। প্রচুর সংগঠন, ছাত্রছাত্রী, যুবকযুবতীরা অংশ নিলেন। অবশেষে সবুজ আদালত স্থগিতাদেশ দিলেন। আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলনে অন্যদেরও এগিয়ে আসা উচিত। যশোর রোডের দুপাশে গাছ বাঁচানোর, পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বাঁচানোর, উত্তরের আত্রেয়ী থেকে দক্ষিণের ইছামতী হত্যা করা নদীগুলিকে জীবনদানের জন্য পরিবেশপ্রেমীদের আন্দোলন চলছে।

গণবিজ্ঞানের দর্শন নিয়ে আলেচনাসভা

৯ জুলাই হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপিঠ হাইস্কুলে ‘গণবিজ্ঞানের দর্শন, দিশা ও ভাবনা কোন পথে’ এসব নিয়ে সারাদিন ব্যাপী এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞান সংগঠনগুলির যৌথ প্রয়াসের পক্ষ থেকে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বিজ্ঞান কর্মীরা বিস্তারিত আলোচনা করেন।

জানো কি?

বিজয় সরকার

❑ বাদুড় কেন উল্টে ঝোলে?

বাদুড় হল একমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণী যারা উড়তে পারে। অথচ, এরা হাঁটতে পারে না। কেন জান? বাদুড়ের পা এবং পায়ের পাতার গড়ন এমন যা তাকে দাঁড়াতে বা হাঁটতে সাহায্য করে না। এদের নখগুলি হুকের মতো দেখতে। ফলে, বাদুড় যখন বিশ্রাম নিয়ে চায়, তখন তার পক্ষে সহজ উপায় হল বাঁকানো নখ দিয়ে গাছের ডাল আঁকড়ে ঝুলে থাকা। এছাড়া, গাছের ডাল থেকে সার্কাসের ট্রাপিজের মতো উড়ে যেতে এই ঝুলে থাকা অবস্থান বাদুড়কে বেশ সাহায্য করে।

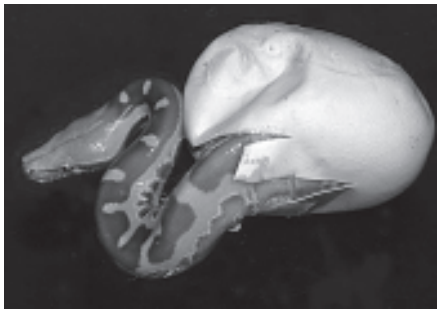

❑ সাপের ডিম ফোটবার আগে আকারে বড় হয় কেন?

পাখিদের ডিম পাড়া এবং কিছুদিন পর ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়া, মাঝের এই সময়কালে ডিমের আকারের কোনো পরিবর্তন হয় না, যদিও ডিমের ভেতরে বাচ্চাটি কিন্তু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। সাপের ডিমের ক্ষেত্রে ভেতরের বাচ্চাটির বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডিমের আকারও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সাপের ডিমের খোলসটি পাখির ডিমের মতো শক্ত নয়, বরং তা নরম ও পিচ্ছিল। ফলে ভেতরের বাচ্চাটি বড় হলে খোলসটিও বড় হতে থাকে। এইভাবে সাপের ডিম মূল আকারের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। এছাড়া সাপের ডিমের আরও কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে। তিন ফুট উচ্চতা থেকে নীচে ফেললেও সাপের ডিম ফেটে যায় না, রাবারের বলে মতো কিছুটা ড্রপও খায়।

ডিমের ভেতরে বাচ্চা সাপটির উপরের চোয়ালে একটি তীক্ষ্ণ দাঁত জন্মায়। ডিম ফুটে বের হওয়ার সময় বাচ্চাটি ঐ দাঁতটি ব্যবহার করে খোলস ফুটো করতে। বের হওয়ার পরই ঐ দাঁতটি খসে পড়ে, আর কখনও তা ওঠে না।

M : 9432335882

একটি আত্মহত্যা ও বিজ্ঞানমনস্কতার শিক্ষা

বিবর্তন ভট্টাচার্য

আমাদের সাধারণ মানুষদের একটা ধারণা আছে, যাঁরা উচ্চশিক্ষিত তাঁরাই মোটামুটিভাবে কুসংস্কারমুক্ত। আর গ্রামে বসবাসকারী গরিবগুর্বো অশিক্ষিতরা সব থেকে বেশি কুসংস্কার জর্জরিত। ব্যাপারটা এত সরলীকরণ করা ঠিক হবে না কারণ একটা ছোট পরিসংখ্যান নেওয়া হয়েছিল শনিমন্দির নিয়ে। দেখা গিয়েছে সারা উত্তর-চব্বিশ পরগনায় যত শনিমন্দির আছে তার দ্বিগুণেরও বেশি শনিমন্দির কলকাতায়। আসলে কয়েকদিন আগে আই-আইটি দিল্লিতে যে ঘটনা ঘটল তা' আরো চোখ খুলে দিল আমাদের।

স্কেচ : সৌরভ মুখার্জী

২০১৩ সালে মধ্যপ্রদেশের ভোপালে বিয়ে হয়েছিল মঞ্জুলার সঙ্গে রীতিশের।

মঞ্জুলার মা সীমা ভোপাল পলিটেকনিক কলেজের কর্মী। একজন বড়ো গণৎকারকে দিয়ে মেয়ের জন্মছক তৈরি করেছিলেন ও ঠিক করেছিলেন যার সঙ্গে মেয়ের জন্মছক মিলবে তার সঙ্গেই বিয়ে দেবেন মঞ্জুলার। এর মধ্যে বহু পাত্র দেখা হয়। সুশ্রী মঞ্জুলার কিন্তু কোথাও জন্মছক মিলছিল না। এরপর সেই সুন্দর দিন এল। ২০১৩ সালে রীতেশের সঙ্গে মঞ্জুলার জন্মছক মিলল। আর জন্মছক মিলে যাওয়াতে মা আনন্দে রীতেশের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই দুজনের বনিবনা হচ্ছিল না। ২০১১ থেকেই মঞ্জুলা দিল্লি আই-আই-টিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এম. টেক করার পর পি.এইচ.ডি. করে। ২০১৩ পর্যন্ত চলছিল। ২০১৭ সালের ১লা জুন মঞ্জুলা দেবকের দেহ দিল্লি আই.আই.টি ক্যাম্পাসে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। সুইসাইড নোট না থাকায় গবেষক মঞ্জুলার বাবা-মা ও অভিভাবকগণ বুঝতে পারেন যে জন্মছক মিলিয়ে বিয়ে দেওয়া ঠিক হয়নি। এর মধ্যে রীতেশ একটা ব্যবসার জন্য সীমার কাছে ২০-২৫ লাখ টাকা দাবি করে পণ হিসেবে যা দিয়ে সে ব্যবসা করবে।

আসলে এখনও আমাদের দেশে ঠিকুজি কুষ্ঠি মিলিয়ে অথবা পণে সন্তুষ্ট করে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করা হয়। কিন্তু আমরা সেই সময় ব্লাডগ্রুপ পরীক্ষা করার কথা মনেও করি না। একজন গবেষকের আত্মহত্যা আমাদের শেখায় যে শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই শিক্ষা নয়, তার সাথে চাই বিজ্ঞান মনস্কতার পাঠ যেখানে এই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা মূল্যহীন।

E.mail : bibartancbss@gmail.com • M : 9332283356

কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ এবং গ্রহের খোঁজ

রতন দেবনাথ

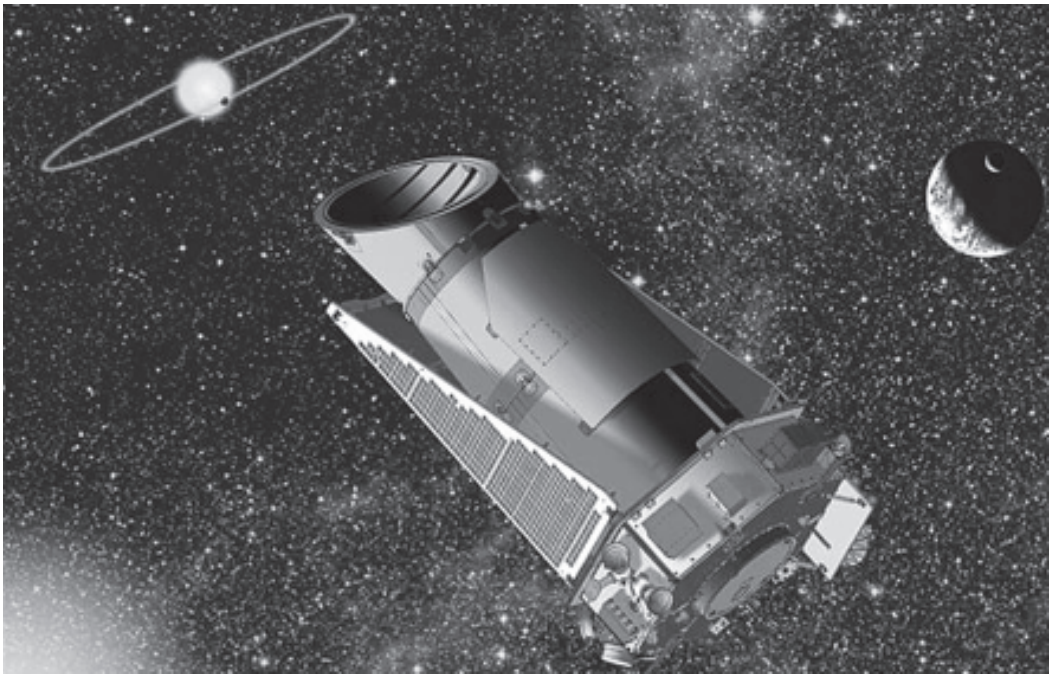

কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ। সুদূর আকাশে নতুন নতুন গ্রহের খোঁজে এক আধুনিক অস্ত্র। ২০০৯ সাল থেকে শুরু করে আজও আকাশের আনাচ-কানাচ খুঁজে নতুন নতুন গ্রহের সন্ধান দিয়ে চলেছে, ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এই টেলিস্কোপ। বিগত আট বছরে সন্ধান দিয়েছে প্রায় ৪৫০০টি সম্ভাব্য গ্রহের।

সৌরজগতের বাইরে থাকা কোন নক্ষত্রকে ঘিরে পাক খাওয়া গ্রহগুলোকে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় বলে বহির্সৌরমণ্ডলীয় গ্রহ বা এক্সোপ্লানেট। বহির্সৌরমণ্ডলীয় গ্রহগুলোর হদিস জানতে ২০০৯ সালে মহাকাশে পাঠানো হয় কেপলার স্পেস টেলিস্কোপটিকে। সিগনাস নক্ষত্রমণ্ডলের একটি নির্দিষ্ট এলাকায় নজর রেখে প্রায় এক লক্ষ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করে কেপলার। আজ পর্যন্ত প্রায় ৩৪০০টি নিশ্চিত এক্সোপ্লানেটের সন্ধান দিয়ে আরও প্রায় ২০০০টি সম্ভাব্য গ্রহের নিশ্চিত করণের দিকে এগিয়ে চলেছে।

কীভাবে গ্রহের খোঁজ করে কেপলার? কেপলার যে নীতিতে গ্রহের খোঁজ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় তা পরিক্রমণ বা ট্রানজিট নামে পরিচিত। কোন নক্ষত্রের সামনে দিয়ে যখন গ্রহের মতো কোন জ্যোতিষ্ক এগিয়ে যায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে বলে পরিক্রমণ বা ট্রানজিট। এসময় নক্ষত্র থেকে আসা আলো কিছুটা বাধা পায়। ফলে দর্শকের চোখে আলোর ক্ষীণতা ধরা পড়ে। কেপলার-এর গ্রহ সন্ধানের কাজটিও হয় ঠিক এইভাবে। কেপলার টেলিস্কোপ নক্ষত্র থেকে আসা আলো পর্যবেক্ষণ করে দীর্ঘ সময় ধরে। দীর্ঘ সময়ের এই পর্যবেক্ষণে যদি দেখা যায় যে আলোর তীব্রতা কখনো কমে যাচ্ছে তখন হতে পারে যে নক্ষত্রটির সামনে দিয়ে কোন গ্রহ এগিয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ তীব্রতর হয় যখন দেখা যায় আলোর তীব্রতা হ্রাস একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরিসরে একাধিক বার ঘটে। তবে দুটি কারণে গ্রহ চিহ্নিত করণের কাজটি বেশ কষ্ট সাপেক্ষ। প্রথমত নক্ষত্রগুলো টেলিস্কোপ থেকে রয়েছে অনেক অনেক দূরে। দ্বিতীয়ত এক্সোপ্লানেটগুলি যে নক্ষত্রকে ঘিরে পাক খাচ্ছে তার তুলনায় অনেক অনেক ক্ষীণ।

এ যাবৎ আবিষ্কৃত এক্সোপ্লানেট সমূহের আয়তনের তথ্য ঘেঁটে দেখা গেছে গ্রহগুলোর আয়তন মোটামুটি দু'রকম— কিছু গ্রহের আয়তন আমাদের পৃথিবীর আয়তনের প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি। এদের বলা হয়ে 'সুপার আর্থ'। এই গ্রহগুলোর গঠন পাথুরে। আবার কিছু গ্রহ রয়েছে যাদের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের দ্বিগুণ থেকে সাড়ে তিনগুনের মধ্যে। আমাদের সৌরমণ্ডলের নেপচুন-এর চেয়ে সামান্য ছোট। সেজন্য এধরনের গ্রহগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে 'মিনি নেপচুন'।

কী কারণে গ্রহগুলো এরকম দুটি নির্দিষ্ট আকারের তার সঠিক ব্যাখ্যা দেওয়া এই মুহূর্তে সম্ভব না হলেও জ্যোতির্বিদগণের মতে কিছু গ্রহ হয়তো পৃথিবীর সমান আকারের এবং এরা এদের ওই নির্দিষ্ট আকারকেই ধরে রাখে। আবার কিছু গ্রহ হয়তো কোনো অজ্ঞাত কারণে গ্যাসীয় আবরণ আঁকড়ে ধরে তাদের আয়তন বাড়িয়ে তোলে।

গ্রহগুলোর আকার নির্ধারণে কেপলার টেলিস্কোপ থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে তাদের আকার সম্বন্ধে আরও সূক্ষ্ম ধারণা দিয়েছে হাওয়াই দ্বীপের কেক অবজারভেটরী। এখানকার গবেষক দল কেপলার টেলিস্কোপ আবিষ্কৃত প্রায় হাজার দেড়েক গ্রহের আকার-আয়তন নির্ণয় করেছেন আরও নিখুঁত ভাবে।

২০০৯ সাল থেকে কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ করে চলেছে বহিঃসৌরমণ্ডলে গ্রহের খোঁজ। ২০১৩ সাল পর্যন্ত নিরন্তর চলেছে সেই কাজ। ২০১৩ সালে টেলিস্কোপে সামান্য ত্রুটির কারণে দূরের গ্রহ পর্যবেক্ষণের কাজ সঠিকভাবে হচ্ছিল না। তাই স্পেস টেলিস্কোপ মিশনের সামান্য পরিবর্তন করে পুনরায় ব্যবহার হচ্ছে টেলিস্কোপটি। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই মিশনের নাম দেওয়া হয় কেপলার-২ বা K-2। K-2 আজও করে চলেছে গ্রহের খোঁজ, তবে কাজের গতি একটু ধীর।

E.mail : rdebnath1961@gmail.com • M : 9477934928

ADMISSION OPEN

Session : 2017-18

Kanchrapara Albatross School

Play group to class-viii
digi school
new building
Ph. 8013191616
03325856660

Dulux
Let's colour

NEROLAC
HEALTHY HOME PAINTS

Authorised Dealer :

SUBINOY PAUL

M. 9231545191
Workshop Road : Kanchrapara, North 24 Pgs.

সৌজন্যে :

BUNTI TRADERS & ORDER SUPPLIERS

Halisahar, Khasbati, North 24 Parganas
ALL PAINTS DEALER

DYNAMIC CARRIER

M : 9883704778
9038000253

(Coaching Centre)

(XI-XII ও স্নাতক স্তর পর্যন্ত)

শিক্ষক : **পরেশ রায়** ১১১, নেতাজী সুভাষপথ, কাঁচরাপাড়া
বিষয় : **ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞান**
শিক্ষিকা : **নন্দিনী দাস**
বিষয় : **বাংলা ও ইংরেজি**

With Best Compliments :

M/S SAHA ENTERPRISE

(Govt. Contractor & General Order Supplier)

Prop. Nitai Saha

Vill & P.O. Simhat
District : Nadia
PIN : 741249
Mobile : 9732552485

"BIGYAN ANNESWAK" VOL : 14 Issue No. 4 July-August 2017 WBBEN/2003/11192 Rs. 5

শব্দের খোঁজে ২ : জলাশয়

পলক বন্দ্যোপাধ্যায়

১			২		৩		৪	
						৫		
	৬	৭						
				৮			৯	
১০							১১	১২
				১৩		১৪		
১৫		১৬						
		১৭				১৮		

❑ **পাশাপাশি :**

(১) ওড়িশার এক নদী, ইহকাল ও পরকালের মাঝে বহে। (৩) মহানদীর এক শাখানদী তিন অক্ষরে নাম, ভৃগু মুণীর কন্যা হিসাবে পার্বতীর আর এক নাম। (৫) পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মহাসাগর বিশেষ। (৬) বাংলার নদ বিশেষ, বিষ্ণুর আরেক নাম, প্লাবিত হয়ে দুঃখ বহে আনতো। (৮) চার অক্ষরে তীরভূমি বোঝায়, একে ও তিনে হেঁট হওয়াকে বোঝায়। (১০) মহারাষ্ট্রের নদীবিশেষ, কথা না বলার কথ্য রূপ। (১১) গঙ্গা নদীর অববাহিকা যা নেপাল দেশে বহে। (১৩) দঃ অসমের নদীবিশেষ, _____ ওবামা। (১৫) উত্তরবঙ্গের নদীবিশেষ, তিস্তা _____ এক্সপ্রেস। (১৭) পশ্চিম অসমের নদীবিশেষ—তিন অক্ষরে নাম, একে ও তিনে বছরের ভাগ, একেও দুইয়ে বুদ্ধি _____ ব্যক্তি। (১৮) তিন অক্ষরে সিকিমের এক নদী, একে ও দুইয়ে উল্টো উনুন, দুই তিন মিলে "চিনে ম্যান চ্যাং _____।"

❑ **উপর নীচে :**

(১) রাশিয়ায় অবস্থিত পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ। (২) মিশরীয় সভ্যতাকে যার দান বলা হয়। (৩) সম্প্রতি রেললাইন সম্প্রসারণের জন্য যে দীঘি ভরাট করা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে গ্রামবাসীদের বিরোধিতা চরম আকার নেয়। (৪) সিন্ধুনদের পাঁচটি শাখানদীর অন্যতম, তিন অক্ষরে নাম, দুইয়ে ও তিনে মিলে এক বিখ্যাত নাটক "শকুনির _____ "। (৫) ঝরনা, "জল _____ "। (৭) নদীর যে প্রশস্ত অংশ অন্য নদীতে বা সমুদ্রে মিলিত হয়। (৯) উঃ আমেরিকার নদীবিশেষ তিন অক্ষরে নাম "_____ শ" প্রথম দুই অক্ষর উল্টোলে এক সাহেবী পোষাক। (১০) বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার নদীবিশেষ, চার অক্ষরে নাম, প্রথম দুইয়ে হাত বোঝায়, শেষ দুইয়ে জল। (১২) চীন দেশের নদীবিশেষ, চার অক্ষরে নাম, এক ও তিন মিলে এক মুসলিম সম্প্রদায়, দুই ও চার মিলে ইংরাজির নৃপতি। (১৩) রাজস্থানের নদীবিশেষ, তিন অক্ষরে নাম, প্রথম দুইয়ে অরণ্যভূমি, এক ও তিনে ইংরাজির মনিব। (১৪) জলপাইগুড়ির নদীবিশেষ, তিন অক্ষরে নাম, এক ও তিনে "ললিত _____ ", দুই ও তিনে উল্টো বিখ্যাত ওয়েস্ট-ইন্ডিজ ব্যাটস্‌ম্যান ব্রায়ান _____ । (১৬) হিমাচলের নদী বিশেষ, উর্দু ভাষায় বাতি/প্রদীপ বিশেষ।

শব্দের খোঁজে ১. পাখি উত্তর

১ শা	রি		২ ব		৩ র	সি	৪ ক	
মু		৫ পা	ন	৬ ডু	বি		লা	
৭ ক	পো	তি		কু		৮ চ	প	৯ ল
		১০ কা	জ	ল	১১ পা	খি		টো
১২ পা	ল	ক			খ		১৩ চ	রা
য়			১৪ বা		১৫ না	১৬ কু	টি	
১৭ রা	১৮ ম	শা	লি	ক		ঠা		
	য়ু		হাঁ		১৯ তা	র	লে	২০ জা
২১ হ	র		২২ স	রা	ল			ং

খুকু ও সূর্য্য

নির্মাল্য দাশগুপ্ত

সূয্যি ঠাকুর, সূয্যি ঠাকুর
প্রশ্ন এইটুকু
এত রোদ দিচ্ছ কেন
ভাবছে খোকা-খুকু

বলছে রবি প্রশ্ন শুনে
একটুখানি হেসে
রোদ দিচ্ছি, আলো দিচ্ছি
আকাশ চাদর ঢেকে

সেই চাদরই ক্রমে ক্রমে
যাচ্ছে ফেটে ফুটে,
চাদরখানি ঠিক রাখো তাই
ভালো থাকবে তাতে।

পত্রিকা যোগাযোগ

চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা
M. 9332283356
জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব
M. 9232387401
প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা
M. 9732681106
কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা
M. 9477589456
তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার
M. 9733153661
কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম
M. 9434686749
গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ
M. 9593866569
পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর
M. 9331035550
বুক মার্ক, বৈচিত্র্য ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট)
স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও উন্নয়ন
M. 9153320581

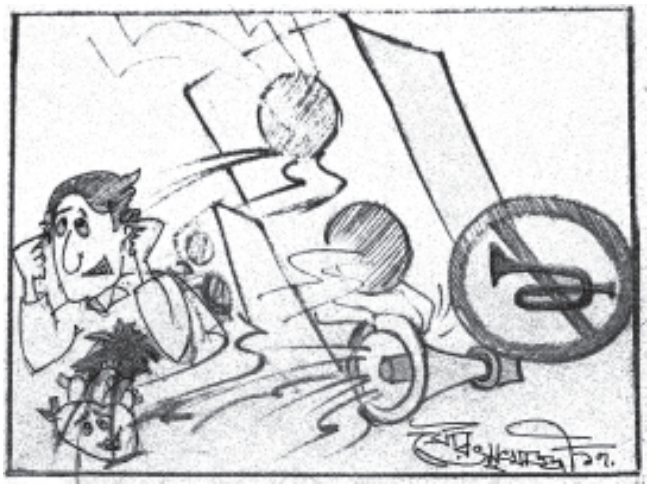

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পো ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো ঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস ঃ রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ ● সম্পাদক ঃ তাপস মজুমদার। ফোন ঃ ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২
সম্পাদকমণ্ডলী ঃ বিজয় সরকার, প্রবীর বসু, শিবপ্রসাদ সর্দার, সম্রাট সরকার, অনুপ হালদার, সুজয় বিশ্বাস, বিবর্তন ভট্টাচার্য
E-mail : bijnandarbar1980@gmail.com/ganabijnan@yahoo.co.in